তৃতীয় অধ্যায়

আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- ডিজিটাল কনটেন্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাঠ্যবিষয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;
- ক্যারিয়ার উন্নয়নে অইসিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারব।

ডিজিটাল কনটেন্ট

কোনো কনটেন্ট যদি ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ করে, প্রকাশিত হয় কিংবা প্রেরিত-গৃহীত হয় তাহলে সেটিই ডিজিটাল কনটেন্ট। তবে সেটি ডিজিটাল বা এনালগ যেকোনো পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হতে পারে। ডিজিটাল কনটেন্ট কম্পিউটারের ফাইল আকারে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্প্রচারিত হতে পারে। লিখিত তথ্য, ছবি, শব্দ কিংবা ভিডিও ডিজিটাল কনটেন্ট হতে পারে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ফলে তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর সহজতর হয়।

ডিজিটাল কনটেন্ট-এর প্রকারভেদ

ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত যেকোনো তথ্য, ছবি, শব্দ কিংবা সবই ডিজিটাল কনটেন্ট। কাজেই নানাভাবে ডিজিটাল কনটেন্টকে শ্রেণিকরণ করা যায়। তবে, ডিজিটাল কনটেন্টকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট
- ছবি
- শব্দ বা অডিও এবং
- ভিডিও ও এনিমেশন।

টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট : ডিজিটাল মাধ্যমে এখনো লিখিত তথ্যের পরিমাণই বেশি। সব ধরনের লিখিত তথ্য এই ধারার কনটেন্ট। এর মধ্য রয়েছে নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, পণ্য বা সেবার তালিকা ও বর্ণনা, পণ্যের মূল্যায়ন, ই-বুক সংবাদপত্র, শ্বেতপত্র ইত্যাদি।

ছবি : সব ধরনের ছবি, ক্যামেরায় তোলা বা হাতে আঁকা বা কম্পিউটারে সৃষ্ট সকল ধরনের ছবি এই ধারার কনটেন্ট। এর মধ্যে রয়েছে ফটো, হাতে আঁকা ছবি, কার্টুন, ইনফো-গ্রাফিক্স, এনিমেটেড ছবি ইত্যাদি।

শব্দ বা অডিও : শব্দ বা অডিও আকারের সকল কনটেন্ট এই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো বিষয়ের অডিও ফাইলই অডিও কনটেন্ট-এর পাশাপাশি ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট অডিও কনটেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

ভিডিও ও এনিমেশন : বর্তমানে মোবাইল ফোনেও ভিডিও ব্যবস্থা থাকায় ভিডিও কনটেন্টের পরিমাণ বাড়ছে। ইউটিউব বা এই ধরনের ভিডিও শেয়ারিং সাইটের কারণে ইন্টারনেটে ভিডিও কনটেন্টের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেটে কোনো ঘটনার ভিডিও সরাসরি প্রচারিত হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় ভিডিও স্ট্রিমিং। এমন কনটেন্টও ভিডিও কনটেন্টের আওতাভুক্ত।

ই-বুক

ই-বুক বা ইলেকট্রনিক বুক বা ই-বই হলো মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ। যেহেতু, এটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে কারণে এতে শব্দ, অ্যানিমেশন ইত্যাদিও জুড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য এখন অনেক ই-বুক কেবল ই-বুক আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মুদ্রিত রূপ থাকে না। ফলে অনেকেই এখন আর ই-বুককে মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক সংস্করণ বলতে নারাজ। এ ধরনের বই কেবল কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা বিশেষ ধরনের রিডার (ই-বুক রিডার) ব্যবহার করে পড়া যায়। প্রচলিত রিডারের মধ্যে অ্যামাজন ডটকমের (amazon.com) কিন্ডল (kindle) সবচেয়ে জনপ্রিয়।

ই-বুক ব্যবহারের সুবিধা

- ই-বুক ডাউনলোডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া সম্ভব।
- ব্যবহারিকভাবে ই-বুক সংরক্ষণের জন্য কোন লাইব্রেরি বা কক্ষের প্রয়োজন নেই, কম্পিউটার বা রিডিং ডিভাইসে ই-বুক সহজে সংরক্ষণ করা যায়।
- ই-বুক সহজে স্থানান্তরযোগ্য ।
- ই-বুকে তথ্য অনুসন্ধান সহজতর।
- ই-বুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বলে কোন ধরনের শিপিং বা প্যাকিং খরচ নেই।
- ই-বুক সহজে বিতরণ ও বিক্রয়যোগ্য।
- ই-বুক মুদ্রণযোগ্য বলে চাহিদা অনুযায়ী প্রিন্ট করা সম্ভব, ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয়।

বিভিন্ন প্রকার ই-বুক

বর্তমানে ই-বুকের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ই-বুক রয়েছে। তবে, সাধারণভাবে ই-বুককে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি। এই ধরনের ই-বুকগুলো মূলত মুদ্রিত বইয়ের মতই হয়ে থাকে। সচরাচর এগুলো পিডিএফ (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট) ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বই একসঙ্গে অথবা অধ্যায় হিসাবে পাওয়া যায়।
- যে ই-বুকগুলো কেবল অনলাইনে তথা ইন্টারনেটে পড়া যায়, এগুলো সচরাচর এইচটিএমএল-এ প্রকাশিত হয়। এগুলোকে বই-এর ওয়েবসাইট বলা যায়।
- মুদ্রিত বই-এর মতো কিন্তু কিছুটা বাড়তি সুবিধাসহ ই-বুক। এগুলো বই-এর কনটেন্ট ছাড়াও পাঠকের নিজের নোট লেখা, শব্দের অর্থ জানা ইত্যাদি সুবিধা থাকে। এগুলোর বেশিরভাগই ই-পাব (EPUB) ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়। এসব ই-বুকের কোনো কোনোটি কেবল বিশেষ ডিভাইসে পড়া যায়। যেমন কিণ্ডল বা আইবুক রিডারে পড়ার উপযোগী ই-বুক। তবে, আইবুকের ক্ষেত্রে নিজস্ব ফরম্যাট রয়েছে।
- চৌকস ই-বুক। এই বইগুলোতে লিখিত অংশ ছাড়াও অডিও/ভিডিও/এনিমেশন ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে। এই বইগুলোকে স্মার্ট ই-বুক বলা হয়। এগুলোর কনটেন্ট মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ। যেমন এতে কুইজ থাকে। কুইজের উত্তর করার ব্যবস্থাও থাকে এবং উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা তাও ই-বুক থেকেই জানা যায়। এমনকি এসব ই-বুকে ত্রিমাত্রিক ছবিও যুক্ত থাকে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে এর উৎপাদনকারী বা নির্মাতারা এ সকল ই-বুক এমন ফরম্যাটে তৈরি করেন যা কেবল নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারে চলে। যেমন ওপেন কম্পিউটার্সের তৈরি আইবুক কেবল আইপ্যাড বা ম্যাক কম্পিউটারে ভালোভাবে পড়া যায়।
- ই-বুকের অ্যাপস। এক্ষেত্রে ই-বুকটি নিজেই একটি অ্যাপস আকারে প্রকাশিত হয়। অ্যাপস ডাউনলোড করে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে পড়া যায়। মুদ্রিত বই-এর মতো ই-বুকও কপিরাইটের আওতায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

শিক্ষায় ইন্টারনেট

আমরা ই-লার্নিংয়ের বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করেছি। সেখানে জেনেছি রেডিও, টেলিভিশন, সিডিরম, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট-ইত্যাদি নানা রকম মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যাপারে ইন্টারনেটের ভূমিকা আলোচনা করব, যার অনেক কিছুই ইতোমধ্যে তোমাদের জানা হয়ে গেছে।

তোমরা সবাই এখন ইন্টারনেট শব্দটির সাথে পরিচিত, অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছ। এ প্রযুক্তিটি সারা পৃথিবীতে খুব বড় একটি পরিবর্তন এনেছে। এ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করার জন্যে আমাদের কিছু অবকাঠামো এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে প্রথমে একটি কম্পিউটার কিংবা স্মার্ট ডিভাইস দরকার। ইদানীং মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তিতে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং মানুষের ক্রয়সীমার ভেতরেই 'স্মার্টফোন' বলে বিবেচিত টেলিফোন চলে এসেছে। স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়। যেহেতু এগুলো টেলিফোন, তাই এর স্ক্রিন ছোট তাই শিক্ষার জন্যে এটি ব্যবহার করা একটু কঠিন। তবে আশার কথাহচ্ছে যে, ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনের মাঝামাঝি একটি সম্ভাবনা রয়েছে যেটি ট্যাবলেট নামে পরিচিত এবং সেটি শিক্ষার কাজে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি অনেক কোম্পানি এই ট্যাবলেটকে মাথায় রেখে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব সেরকম অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে শুরু করেছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করার উপযোগী কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন হাতে চলে এলেই আমরা কিন্তু ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করতে পারি না। প্রয়োজন হয় ইন্টারনেট সংযোগের। দেশের সব জায়গায় সমানভাবে ইন্টারনেট সংযোগ নেই, তাই সবাই সমানভাবে ইন্টারনেটে স্পিড পায় না এবং ইন্টারনেটের স্পিড কম হলে সেটি ব্যবহার করা অনেক সময়েই অর্থহীন হয়ে যায়। আবার ভালো স্পিডের ইন্টারনেট পেতে হলে যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয় সেটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কাজেই শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে এই ইন্টারনেট সংযোগটি অনেক সাশ্রয়ী খরচে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্ভব হলে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি এই দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীর ল্যাপটপ কিংবা ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ থাকে এবং দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইডথের (Bandwidth) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকে তাহলেই কিন্তু পুরোটা শেষ হয়ে যাবে না। এরপরের প্রশ্ন ইন্টারনেটে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কী ব্যবহার করবে? তাদের উপযোগী Contents কী রয়েছে? সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষায় সেগুলো এখনো সেভাবে নেই। সেগুলো সরকারি উদ্যোগে কিংবা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আমরা খুব দ্রুত সেগুলো ইন্টারনেটে পেতে শুরু করব বলে আশা করছি।

এ মুহূর্তে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী পড়ালেখা করতে করতে কোনো একটা বিষয় বুঝতে না পারলে সে যদি ইন্টারনেটে সেটি অনুসন্ধান করে– মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় সে তার উত্তরটি কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যাবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় শিখতে চায় কিংবা জানতে চায় সে ইন্টারনেটে তা খুঁজে বের করে নিতে পারবে– এজন্যে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের পাশাপাশি অত্যন্ত দক্ষ সার্চ ইঞ্জিনও আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদগণ তৈরি করেছেন। তবে এ সার্চ ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

গণিতের অত্যন্ত চমৎকার কিছু সাইট রয়েছে যেখানে গণিতের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাতে-কলমে দেখার জন্যেও সাইট রয়েছে। উৎসাহী মানুষেরা নানা বিষয়ে গ্রুপ তৈরি করে রেখেছেন, তাদের কাছে যেকোনো প্রশ্ন দেওয়া হলে তারা উত্তর দিতে পারেন। বাংলায় শিক্ষা দেয়ার জন্যেও ইন্টারনেটে অত্যন্ত চমৎকার কিছু সাইট রয়েছে।

ইন্টারনেটে শিক্ষার একটা বিশাল জগৎ বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা প্রমাণিত ভবিষ্যতে শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারনেট ও আমার পাঠ্য বিষয়গুলো

একজন শিক্ষক আসলে একটা আলোক শিখার মতো। তিনি অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেন, সেই আলোতে চারদিক আলোকিত হয়। শিক্ষার্থীরা সেই আলোতে সব কিছু দেখতে পায় এবং নিজেদের যেটুকু প্রয়োজন কিংবা যেটুকু শিখতে চায় সেটুকু শিখে নেয়। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকও আসলে কাউকে কিছু শেখাতে পারেন না– তারা শুধু সাহায্য করেন, শিক্ষার্থীকে নিজেরই সব কিছু শিখতে হয়।

শিক্ষার সাথে ইন্টারনেট শব্দটি জুড়ে দিয়েও একটি ব্যাপার মনে করিয়ে দিতে হবে, কেউ যেন মনে না করে ভালো ইন্টারনেট সংযোগ কিংবা ইন্টারনেটে খুব ভালো Content থাকলেই রাতারাতি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় খুব ভালো হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগটা দিয়ে নতুন একটি জগৎ উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে মাত্র, সেই জগৎ থেকে কতটুকু গ্রহণ করবে সেটা পুরোপুরি একজন শিক্ষার্থীর ব্যাপার। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তোমাদের পরিচিত কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে শুধু কম্পিউটার গেম খেলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে সময় নষ্ট করছে। আবার সেই সুযোগ গ্রহণ করে অন্য কেউ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখছে।

তোমরা জানো ইন্টারনেটে তোমাদের সকল পাঠ্যবইগুলো পাওয়া যায়। বছরের শুরুতে তোমাদের হাতে পাঠ্যবইগুলো পৌঁছে যায়। কোনো কারণে সেই বই যদি কেউ হারিয়ে ফেল, কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তোমরা কিন্তু তখন ইচ্ছে করলে ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তোমরা শুনে খুশি হবে বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী মানুষেরা মিলে এই বইগুলোর সফ্‌ট কপি তৈরি করে সেগুলোতে কণ্ঠ দিয়ে বইগুলো সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও এই বইগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে।

> **কাজ**
>
> তোমরা কীভাবে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে উপকৃত হতে পার? ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে এ বিষয়ে অনধিক ১০০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে তোমাদের জন্যে সবগুলো বই প্রকাশ করা হয় এবং বিনামূল্যে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তার বাইরেও তোমাদের লেখাপড়ার কাজে লাগতে পারে এরকম অনেক বই লেখা হয়। (এখানে কিন্তু মোটেও গাইড বইয়ের কথা বলা হচ্ছে না– সেগুলো কখনোই কাউকে শিখতে সাহায্য করে না।) যারা সেই বই লেখেন তাদের অনেকেই এ বইগুলো তোমাদের ব্যবহারের জন্যে ইন্টারনেটে দিয়ে দেন। বাজার থেকে টাকা দিয়ে বই না কিনে যেকেউ এ বইগুলো ইন্টারনেট থেকে সরাসরি নামিয়ে নিতে পারে। পৃথিবীর অনেক লেখকই আজকাল তাদের বইগুলো ইন্টারনেটে সবার জন্যে

উন্মুক্ত করে দিতে শুরু করেছেন। তোমরা একটু খোঁজ করলেই তোমার পছন্দের অনেক বই একেবারে বিনামূল্যে ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে। তবে তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন তুমি কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে কারো রাখা বই বেআইনিভাবে নামিয়ে না ফেলো।

আমরা সবাই জানি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যেটুকু থাকে সেটুকুতে ছাত্রছাত্রীরা সন্তুষ্ট থাকে না, তারা আরো বেশি জানতে চায়। সেজন্যে সব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শখের বিষয় বিজ্ঞান, গণিত কিংবা সাহিত্যের ক্লাব তৈরি করে। এক সময় এধরনের ক্লাবে শুধু শারীরিকভাবে উপস্থিত ছেলেমেয়েরাই অংশ নিতে পারত। ইন্টারনেট হওয়ার কারণে বিষয়টা এখন পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন সারা দেশের এমনকি সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা এই ক্লাবগুলোতে অংশ নিতে পারে। তারা সবাই মিলে পাঠজগতের বিষয়গুলোকে অন্য একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশেও এখন বিভিন্ন বিষয়ের অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হচ্ছে এবং তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছো।

আমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার ও আইসিটি

একবিংশ শতাব্দিতে আইসিটিবিহীন একটি দিনও কল্পনা করা সম্ভব নয়। আইসিটির সর্বমুখী ব্যবহারের কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে যোগ দেওয়া কিংবা নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি উভয় ক্ষেত্রে আইসিটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না।

নিজের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে তাই আইসিটিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিজেকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। সাধারণ অফিস সফটওয়্যারের ব্যবহার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসহ প্রায় সব কিছুতেই প্রাথমিক দক্ষতা না থাকলে আগামীতে কোথাও চাকরি পাওয়া কঠিন হবে। অন্যদিকে প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট বিনির্মাণ, কম্পিউটার নিরাপত্তা ইত্যাদি বিশেষায়িত কাজের চাহিদাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্যারিয়ার গঠনের একটি বড় ক্ষেত্র। তথ্য প্রযুক্তির প্রধান উপকরণটি বলা চলে কম্পিউটার। এ কম্পিউটারে যে কতশত কাজ আছে তা কল্পনাতীত। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল, কল সেন্টার ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, অফিস অটোমেশন সিস্টেম ডিজাইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মোবাইল কমিউনিকেশন, ডেটা কমিউনিকেশন এমন হাজারটি ক্যারিয়ারের নাম বলা যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রোগ্রামিংয়ে সম্ভাবনার দ্বার দিন দিন উন্মোচিত হচ্ছে। প্রোগ্রামিংয়ের চাহিদা বর্তমানে অনেক বেশি। সবকিছুই এখন কম্পিউটারাইজড হচ্ছে, বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়েই এ প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। স্মার্টফোনের বিভিন্ন অ্যাপস প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমেই করা। প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় অফিসে বসেই ঘরের টিভি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে মানুষের রোগ নির্ণয় করা যাবে। দিন দিন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের আকৃতি ছোট হয়ে আসছে এবং এদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি আরও বৃদ্ধি পাবে। রান্না থেকে স্যাটেলাইট পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই মানুষের হাতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে। এর সব কিছুই পরিচালিত হবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে।

বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে আমাদের দেশের ভালো প্রোগ্রামাররা দেশে বসেই গুগল, মাইক্রোসফট, ইনটেল, ফেসবুকের মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলোর কাজ করতে পারছেন। তাছাড়া ভালো প্রোগ্রামাররা ইচ্ছা করলে নিজেরাই সফটওয়ার ফার্ম খুলতে পারেন।

পেশা হিসেবে প্রোগ্রামিংয়ের আলাদা একটি গুরুত্ব আছে। কারণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করার অনেক সুযোগ এখানে রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সরাসরি বিশ্বের নামকরা অনেক সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যেমন মাইক্রোসফট, গুগল, ফেসবুক কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবছরই বাংলাদেশ থেকে অনেকেই নিজের মেধাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্ত অবস্থান করে নিচ্ছে এই সব বিখ্যাত কোম্পানিতে। আর একটি মজার ব্যাপার হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব বড় কোম্পানিতে আবেদন করার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো ভালো প্রোগ্রামারকে খুঁজে বের করে নেয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে কাজ করার রয়েছে আরও সুবিধা। এতে কোন অফিসে না গিয়েই কাজ করার সুযোগ রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর ভালো ভালো কোম্পানি তাদের নিজেদের দেশের কর্মীদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের কর্মীদের কাজ করার সুযোগ দেয়। আমাদের দেশের কর্মীরা বিশ্বমানের। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রোগ্রামারসহ অনেক আইসিটি কর্মী ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ করছে আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেনের মতো দেশগুলোর বড় বড় কোম্পানিতে।

ফ্রিল্যান্সের কাজ করার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভাষায় ভালো দক্ষতা থাকলেই চলে। এছাড়াও আইসিটিতে রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এ কাজ করার সুযোগ। যেসব কোম্পানি নিজেরা সার্ভার ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়। তাই চাকরির বাজারে এর অবস্থানও অনেক ভালো। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ লোকের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে বেশ কিছু সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন সফটওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করছে। এটি আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অনেক শিক্ষার্থী এই পেশার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই সেক্টরে আরও অনেক দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে। কাজেই ক্যারিয়ার হিসেবে আইসিটির সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল। এসব বিবেচনা করে নিজের আইসিটি দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে এখন থেকেই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১. ওয়েব সাইটে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই কোনটির প্রয়োজন?

ক. ডেস্কটপ পিসি খ. ট্যাবলেট পিসি

গ. স্মার্টফোন ঘ. ইন্টারনেট সংযোগ

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি?

ক. কম্পিউটার খ. টেলিভিশন

গ. ইন্টারনেট ঘ. স্মার্টফোন

৩. ডিজিটাল কনটেন্ট হলো–

i. ই-বুক, ব্লগপোস্ট ও ই নিবন্ধ

ii. ইনফো গ্রাফিকস ও এ্যানিমেটেড ছবি

iii. অডিও ও ভিডিও স্ট্রিমিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের লেখাটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিনি ও রনির বাবা তাদের জন্য একটি ট্যাবলেট পিসি কিনে দিলেন। রিনি নবম শ্রেণিতে ও রনি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে।

৪. রিনি ও রনির ট্যাবলেট পিসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার হবে-

ক. গেমস খেলায় খ. গান শোনায়

গ. হিসাব নিকাশে ঘ. লেখাপড়ার কাজে

৫. রিনি ও রনির জন্য ট্যাবলেট পিসিটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে-

i. দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন

ii. কমখরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে

ii. ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়াতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. আইসিটি কীভাবে আমাদের ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

৭. 'বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছাড়া লেখাপড়া করা কঠিন'- যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।